Vol. 6 | No. 1 | 1962

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রীঃ)

Volume	6
Issue	1
Year	1962
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আবদুল করিম
Published online	June 15, 1962
DOI	10.62328/sp.v6i1.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v6i1.7
Pages	221-232
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

গ্রন্থ-পরিচয়

Check for updates

বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর ঃ স্বাধীন সুলতানদের আমল (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রীঃ) ঃ শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়। শ্রীনন্দদুলাল দে, শান্তিনিকেতন, ১৯৬২ ॥ পৃষ্ঠা সংখ্যা ১/১—১২০/১ + ১—৪৫৮ ॥ মূল্য ১৩·৫০ টাকা ॥

আলোচ্য বইটিতে বাংলার স্বাধীন সুলতানদের দুশো বছরের (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রীঃ) রাজনৈতিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে। গ্রন্থকার সুলতানী আমলের বাংলা দেশের পূর্ণাঙ্গ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু বইয়ের আয়তনের দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি আপাততঃ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস স্থগিত রেখেছেন (পৃষ্ঠা ১৭/১)। তবে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন যে শীঘ্র তিনি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসও প্রণয়ন করবেন (১৯/১)।

একাধিক কারণে বইটী সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। প্রথমতঃ বইটি বাংলা ভাষায় লিখিত এবং প্রকাশক যথার্থই দাবী করেছেন যে "বাংলা ভাষায় এই পর্বের সুবিস্তৃত ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা এই প্রথম।" রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'বাংলার ইতিহাস' ২য় ভাগের চাইতে অনেক বেশী মাল মসলা এই বইটীতে ব্যবহার করা হয়েছে এবং সময়ের ব্যবধানের ফলে, বা যে কারণেই হোক, আলোচ্য বইটী রাখাল দাসের বই এর চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারে। প্রকাশক আরও বলেছেন যে "অন্য ভাষাতেও সমগ্র পর্বটি ইতিপূর্বে এত পূর্ণাঙ্গ আকারে আলোচিত হয়নি।" প্রকৃত পক্ষে গ্রন্থকার এমন অনেক সূত্র থেকে বিষয়বস্তু আহরণ করেছেন যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত *History of Bengal*, vol. II তে পাওয়া যায় না।

আলোচ্য বইটী ছয়টী অধ্যায়ে বিভক্ত এবং এই অধ্যায়গুলিতে বাংলার স্বাধীন সুলতানদের ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনার জন্য এইরূপ ধারাবাহিক বর্ণনাই প্রকৃত পন্থা। ক থেকে ছ পর্য্যন্ত পরিশিষ্টে নানা জটিল প্রশ্ন আলোচিত হয়েছে, অতিরিক্ত টীকা ও সংশোধনী

সংযোজিত হয়েছে এবং হিজরী ও খ্রীষ্টাব্দ সনের তুলনামূলক তালিকা দেওয়া হয়েছে। আবিষ্কৃত সূত্রের পরিমাণ-সাপেক্ষ সকল সুলতানদের সম্বন্ধে আলোচনা সমপর্য্যায়ের হয়নি, তাতে গ্রন্থকারের কোন হাত নেই। সুখময় বাবু প্রারম্ভেই বিনয় পূর্বক এই দুরূহ কার্য্যে নিজের অযোগ্যতা নিবেদন করেছেন, কিন্তু বইটা আদ্যোপান্ত পাঠ করলে মনে হয় বিনয়ের আতিশয্য আছে। কিন্তু তবুও বইটার ত্রুটী বিচ্যুতি যে মোটেই নাই তা বলা যায় না; সেগুলির দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়াস পাচ্ছি।

সামগ্রিকভাবে বিচার করলে যে প্রশ্নটী প্রথমেই নজরে পড়ে তা হচ্ছে, কতকগুলি সমসাময়িক বা কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী সময়ের ইতিহাসের প্রতি গ্রন্থকারের পক্ষপাতিত্ব। যেমন যিয়ায়ুদ্দীন বারণীর 'তারিখ-ই ফিরোজ শাহী,' ইয়াহয়া বিন আহমদ সরহন্দীর 'তারিখ-ই মুবারক শাহী,' ইবনে বত্তুতার ভ্রমণ বৃত্তান্ত (রিহলা) -কে তিনি অনেক প্রশ্নের মীমাংসার জন্য "নির্ভুল" ও "অভ্রান্ত" আখ্যা দিয়েছেন। পরবর্ত্তীকালের লিখিত ইতিহাসের উপর এইসব সমসাময়িক গ্রন্থের প্রাধান্য যেমন অনস্বীকার্য্য, তেমনি ক্ষেত্রবিশেষে সমসাময়িক গ্রন্থেও যে ভুল থাকতে পারে তাও অস্বীকার করা যায় না। বারণী বা ইয়াহয়া বিন আহমদ কেউ বাংলা দেশে আসেননি; তাঁরা তাঁদের বইয়ের মাল মসলা যোগাড় করেছেন দিল্লীতে বসে; পক্ষান্তরে ইবনে বত্তুতা যদিও বাংলা দেশে এসেছিলেন, তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনকালে নিজের রোজ-নামচা হারিয়ে ফেলেন। বর্ত্তমানে ইবনে বত্তুতার যে ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাওয়া যায় তা তাঁর স্মৃতি-ভাণ্ডার মন্থন করে লেখা। এমতাবস্থায় তাঁদের বর্ণনা "নির্ভুল" বা "অভ্রান্ত" আখ্যা দেওয়ার আগে সমসাময়িক মুদ্রা বা শিলালিপির সঙ্গে তাঁদের বর্ণনার মিল হয় কিনা বিচার্য্য।

আলোচ্য বইএর বিভিন্ন যায়গায় আরবী, ফার্সী, ইংরেজী এবং বাংলা ভাষায় লিখিত বই এর উদ্ধৃতি এবং তর্জমার যথেষ্ট ছড়াছড়ি আছে। ফলে ধারাবাহিক বর্ণনা বিশেষভাবে ব্যাহত হয়েছে। এই সবের অনেক অংশই সহজে বাদ দেওয়া যেত। বিভিন্ন সুলতানের ইতিহাস বর্ণনার পর যেভাবে তার অমাত্য ও কর্ম্মচারীদের নাম দেওয়া হয়েছে তাতে ঐ অংশ নিছক ক্যাটালগে পরিণত হয়েছে। শাসন কার্য্যে ঐ সব অমাত্যের স্থান নির্দ্ধারণ করলে এবং বিভিন্ন শিলালিপির সূত্র থেকে শাসন ব্যবস্থার উপর যেসব প্রমাণ পাওয়া যায়, তা বিশদ ব্যাখ্যা

করলে আলোচনা সর্বাঙ্গ সুন্দর হত। বই এর শেষে গ্রন্থপঞ্জীর অভাবে ভবিষ্যত গবেষকেরা কিছু অসুবিধা ভোগ করবেন।

অতঃপর বিশেষ বিশেষ প্রশ্নের আলোচনায় যে সব ত্রুটী বিচ্যুতি নজরে আসে, সে সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। এই সব ত্রুটীগুলি কয়েকটী পর্য্যায়ে ভাগ করা যায় ঃ—

(১) মনে হয় সুখময় বাবু আরবী ও ফার্সী ভাষায় বিশেষ বুৎপন্ন নন এবং সেই কারণেই তিনি আরবী ও ফার্সী সূত্র ব্যবহারের সময় ইংরেজী অনুবাদের সাহায্য নিয়েছেন। কোন অনুবাদই মূলের সমকক্ষতা দাবী করতে পারে না এবং হয়ত এই কারণেই সুখময় বাবু কয়েক ক্ষেত্রে অনুবাদকের দ্বারা ভ্রান্ত পথে চালিত হয়েছেন।

(ক) পৃষ্ঠা ২৬। ১। এলিয়ট এবং ডাউসন অবলম্বনে যিয়াউদ্দীন বারনীর 'তারিখ-ই-ফিরূয শাহী'র নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে ঃ—

> "প্রায় এই সময়ে বাংলা দেশে বহ্‌রাম খানের মৃত্যুর পরে ফখরা বিদ্রোহ করে। ফখরা এবং তার বাঙ্গালী সৈন্যরা কদর খানকে হত্যা করে এবং তার স্ত্রী, পরিবার ও আধীনস্থ লোকদের খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলে। সে তারপর লখনৌতির ধন-সম্পদ লুঠ করে ঐ স্থান এবং সাতগাঁও ও সোনার গাঁও দখল করে। এই ভাবে সম্রাট (মুহম্মদ তুঘলক) এইসব স্থান হারালেন, এগুলি ফখরা ও অন্যান্য বিদ্রোহীদের হাতে গিয়ে পড়ল এবং আর এদের পুনরুদ্ধার করা হল না।"

কিন্তু মূল ফার্সী অবলম্বনে তর্জ্জমা হয় নিম্নরূপঃ—

> "এই সময়ের দ্বিতীয় ঘটনা হচ্ছে বাংলা দেশে বাহরাম খানের মৃত্যুর পরে ফখরার গোলযোগ। ফখরা ও বাঙালী সৈন্যরা বিদ্রোহী হয় এবং কদর খান নিহত হয় এবং তার স্ত্রী, পুত্র, হাতী ও অস্ত্র শস্ত্র খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়। লখনৌতির সম্পদ লুণ্ঠিত হয় এবং লখনৌতি, সাতগাঁও, সোনার গাঁও হস্তচ্যুত হয় এবং ফখরা ও অন্যান্য বিদ্রোহীদের হাতে পড়ে এবং অতঃপর আর পুনরুদ্ধার করা যায় না"।

সুখময় বাবু তাঁর উদ্ধৃতি থেকে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে ফখরুদ্দীন লখনৌতি, সাতগাঁও ও সোনার গাঁও অধিকার করেন। মূল ফার্সীর সঙ্গে তুলনা করলে তিনি দেখতেন যে এইমত গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, প্রথমতঃ বারণী বলেছেন যে লখনৌতি, সাতগাঁও ও সোনারগাঁও দিল্লীর অধীনতা ছিন্ন করল, কিন্তু কে এই সবের অধিকারী হল তার কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। দ্বিতীয়তঃ বারণীর উক্তিমত এইসব স্থান ফখরা ও অন্যান্য বিদ্রোহীদের হাতে পড়ল; এতে বোঝা যায় যে ফখরা ছাড়া অন্য কোন বিদ্রোহীও একটী বা দুইটী স্থান অধিকার করেছিল এবং এই বিদ্রোহীরা কে তার কোন ইঙ্গিত নেই; এই সময়ের ঘটনা বর্ণনায় বারণীতে ইলিয়াস হাজী বা আলী মুবারকের কোন উল্লেখ নেই। আরও একটা বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন বারণী ইতিহাস রচনা করেছেন ফখরার বিদ্রোহের ২০ বৎসর পরে ১৩৫৮ খীষ্টাব্দে দিল্লীর নিকটে বসে। মুহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকালীন বাংলা সম্পর্কে বারণীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে বুঝা যায় বাংলার রাজনৈতিক বিবর্ত্তনের সম্পূর্ণ ইতিহাস বারণীর জানা ছিলনা। ১৩৩৮ থেকে ১৩৫৩ সাল পর্যন্ত সময়ের (যে সময়ের মধ্যে ফখরুদ্দীন, আলী মুবারক এবং ইখতিয়ারউদ্দীন গাজী শাহ তিনজন সুলতান রাজত্ব করেন এবং ইলিয়াস শাহ নানা যুদ্ধের পর সারা বাংলার স্বাধীন সুলতান হয়ে বসেন) ইতিহাস বারণী উপরে উদ্ধৃত কয়েকটা ছত্রের মধ্যে খতম করে দিয়েছেন। সুতরাং বারণীর বর্ণনাকে "নির্ভরযোগ্য" বলা যায় না। সুখময় বাবু ইয়াহয়া বিন আহমদের 'তারিখ-ই মুবারক শাহী'তে বারণীর সমর্থন পেয়েছেন এবং এই বই থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়েছেন, কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেন নি যে যেখানে বারণী কয়েকটা ছত্রে ১৫ বৎসরের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন, এবং এক কলমেই সমগ্র বাংলা দেশকে দিল্লীর হস্তচ্যুত করে দিয়েছেন, সেখানে ইয়াহয়া বিন আহমদ অন্ততঃ কয়েকটা যুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ বরণীর বিবরণ মতে কদর খান নিহত হয় লখনৌতিতে, অপর পক্ষে ইয়াহয়ার মতে কদর খান নিহত হয় সোনারগাঁওএ।

তারিখ-ই-মুবারক শাহীর দুইটী সূত্রের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ সুখময় বাবুর অনুবাদ মতে (এবং এই অনুবাদ নির্ভুল) ঃ

> "তারপর যে যুদ্ধ হল, তাতে ফখরুদ্দীন পর্যুদস্ত হয়ে পলায়ন করল। পলাতকের হাতী ও ঘোড়াগুলি বিজয়ী পক্ষের দখলে এল। কদর খান ঐ জায়গায় রইলেন অন্যান্য আমার তাঁদের নিজের নিজের জায়গীরে ফিরে গেলেন।" (পৃ ১৭।১)

অন্যান্য আমীরদের মধ্যে সাতগাঁও এর শাসনকর্ত্তা ইজ্জদ্দীন ইয়াহয়াও ছিলেন। তিনি যদি নিজ জায়গীরে অর্থাৎ সাতগাঁওএ ফিরে গিয়ে থাকেন তাহলে ফখরা বা ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ কিভাবে সাতগাঁও অধিকার করেন বুঝা যায়না। সুখময় বাবু যদিও বারণীর 'তারিখ-ই-ফিরুজ শাহী' ও ইয়াহয়া বিন আহমদের 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'কে সূত্ররূপে ব্যবহার করেছেন ও দুইটীই প্রমাণ্য বলে ঘোষণা করেছেন, তবুও বারণীর সাক্ষ্য গ্রহণ করার সময় তিনি ইয়াহয়া বিন আহমদের এই উক্তির অসারতা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন নি। দ্বিতীয়ত 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'র একজায়গায় সুখময় বাবু অনুবাদ করেছেন,

> 'ফখরুদ্দীন সোনারগাঁওকে তার রাজধানী করল এবং তার গোলাম মুখলিসকে লখনৌতিতে রেখে দিল। কদর খানের অধীনস্থ আরিজ-ই-লস্কর (সৈন্যবাহিনীর বেতনদাতা) আলী মুবারক মুখলিশকে বধ করে লখনৌতি অধিকার করল।... (পৃষ্ঠা ১৭/১)।

'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'র এই সূত্র থেকে মনে হয় ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ লখনৌতি অধিকার করেছিলেন কিন্তু পরবর্তী বিশদ বিবরণ পাঠে মনে হয় যে লখনৌতি সাময়িকভাবে অধিকার করলেও ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ লখনৌতি বেশী দিন দখলে রাখতে পারেননি এবং আদৌ তিনি লখনৌতি দখল করেছিলেন কিনা তাতে সন্দেহের অবকাশ আছে।

সুস্পষ্ট প্রমাণের অভাব থাকলে পূর্ব ঐতিহাসিকদের মতামতই বহাল রাখা যুক্তিসঙ্গত। সে মত এই যে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ শুধু পূর্ব বাংলার স্বাধীন সুলতান ছিলেন। মুদ্রার সাক্ষ্যও এই মত সমর্থন করে। কিন্তু সুখময় বাবু তাঁর এই নতুন মতের উপর নির্ভর করে আর একটি মত স্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। তিনি ইবনে বত্তুতা বর্ণিত সোদকাওয়ানকে সাতগাঁওএর সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন (পৃষ্ঠা ২৯/১ এবং পরিশিষ্ট ক)। ইতিপূর্ব্বে অনেকেই সোদকাওয়ানকে সাতগাঁও এর সঙ্গে অভিন্ন প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন এবং তাঁদের স্বপক্ষে যুক্তিরও অভাব নেই; কিন্তু সুখময় বাবু তাঁর উপরোক্ত এই নতুন মতের সাহায্যে তা জোরালো করার চেষ্টা করেছেন। গ্রন্থকার সোদকাওয়ান সম্বন্ধে যে কোন মত পোষণ করতে পারেন (আমি নিজে সোদকাওয়ানকে চট্টগ্রামের সঙ্গে অভিন্ন মনে করি এবং এতদসম্পর্কে ভট্টশালীর

যুক্তিগুলিকেই অধিকতর বিজ্ঞান-সম্মত মনে করি), কিন্তু তাঁর এই নতুন তথ্য, যা এখনও প্রমাণসাপেক্ষ, সে বিষয়ে তাঁকে বিশেষ সাহায্য করে না।

(খ) পৃষ্ঠা ৫৯/১এ কে, কে, বসু অনূদিত 'তারিখ-ই-ই-মুবারক শাহী' অবলম্বনে গ্রন্থকার বলেছেন যে ফিরুয শাহ তুঘলকের সঙ্গে ইলিয়াস শাহের একডালার যুদ্ধে "বাঙালীদের প্রধান সেনাপতি ছিলেন সহদেও (সহদেব), তিনি যুদ্ধে নিহত হন।" মূল ফার্সী শব্দ "মোকদ্দম-ই-পাইকান" এর অর্থ পাইকদের নেতা বা প্রধান সেনাপতি ধরা যায়। সহদেব নিশ্চয়ই ইলিয়াস শাহের একজন প্রধান সহায়ক ছিলেন, কিন্তু তাঁকে 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী' বাঙালীদের প্রধান সেনাপতি আখ্যা দেন নি।

(২) কয়েকটা ক্ষেত্রে গ্রন্থকার স্বল্প প্রমাণের উপর নির্ভর করে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। এসব ক্ষেত্রে কিছু কিছু অনুমান করা হয়ত সম্ভব, কিন্তু অকাট্য যুক্তি হিসাবে প্রয়োগ বোধ হয় বিজ্ঞানসম্মত নয়। প্রসঙ্গতঃ নীচের উদাহরণগুলি উল্লেখ করা যায় ঃ—

(ক) পৃষ্ঠা ৩৫/১—৩৬/১। ইখতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহকে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহএর পুত্র প্রমাণ করে গ্রন্থকার লিখেছেন ঃ

> ইখতিয়ারুদ্দীন যে ফখরুদ্দীনের পুত্র, সে সম্বন্ধে আমাদের কোন সংশয় নেই। তবে ইব্‌ন্ বত্তুতার একটি উক্তি এ সম্বন্ধে খানিকটা সংশয়ের সৃষ্টি করে। ইব্‌ন্ বত্তুতা লিখেছেন যে ফখরুদ্দীন শায়দা নামক একজন ফকীরকে সাতগাঁও এর শাসন কর্ত্তার পদে নিযুক্ত করে কোন একজন শত্রুর বিরুদ্ধে যখন যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন, তখন দুষ্ট শায়দা ফখরুদ্দীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ফখরুদ্দীনের পুত্রকে হত্যা করে। এইটি ছাড়া সুলতানের আর কোন পুত্র ছিল না। ফখরুদ্দীনের একমাত্র পুত্র যখন শায়দার হাতে নিহত হয়েছিলেন বলে জানা যাচ্ছে, তখন ইখতিয়ারুদ্দীন ফখরুদ্দীনে পুত্র হন কেমন করে? এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর এই যে, ইব্‌ন্ বত্তুতার বাংলাদেশে ভ্রমণের পরে ফখরুদ্দীনের আর একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনিই ইখতিয়ারুদ্দীন। এইমত যদি সত্য হয় তাহলে বলতে হবে ৭৫০ হিজরায় সিংহাসনে আরোহনের সময় ইখতিয়ারুদ্দীন নিতান্ত শিশু ছিলেন, কারণ ৭৪৭ হিজরা বা ১৩৪৬ খ্রীষ্টাব্দ ইব্‌ন্ বত্তুতা বাংলাদেশে ভ্রমণ করেন। ৭৫৩ হিজরায় যখন ইখতিয়ারুদ্দীনের রাজত্বের অবসান হয়, তখনও তিনি শিশুই ছিলেন। আমাদের মত সত্য হলে কেন ইখতিয়ারুদ্দীন কোন ইতিহাস গ্রন্থে উল্লিখিত হয় নি, তা বোঝা যাবে।"

এ ক্ষেত্রে সুখময় বাবু একটু মুস্কিলেই পড়েছেন। একদিকে তিনি মনে করেন ইব্‌ন্ বত্তুতার বিবরণ অভ্রান্ত (পৃষ্ঠা ৩৮৩-৮৪), অন্যদিকে কোন সমসাময়িক ইতিহাস গ্রন্থে ইখতিয়ারুদ্দীনের উল্লেখ নেই। অপর পক্ষে ইখতিয়ারুদ্দীনের নামাঙ্কিত মুদ্রাও পাওয়া যাচ্ছে। এই তিন সূত্রের সমন্বয় করতে গেলে ইখতিয়ারুদ্দীনকে শিশু না বানালে চলে না। শিশু হোক আর বয়স্কই হোক, ইখতিয়ারুদ্দীন সুলতান ছিলেন, তাঁর নামে মুদ্রা প্রচলিত ছিল এবং মুদ্রার সাক্ষ্য মত তিনি তিন বৎসর রাজত্ব করেন। সুতরাং শিশু বলেই ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় তাঁর উল্লেখ না থাকার কোন হেতু নাই।

এই বিষয়টা নিয়ে এত কাঠখড় পোড়ানোর কি দরকার ছিল বলা যায় না। ইখতিয়ারুদ্দীন তাঁর মুদ্রায় নিজেকে সুলতানের পুত্র বলে ঘোষণা করেছেন। তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী সুলতানের নাম ফখরুদ্দীন শাহ। দুই জনেই একই টাকশাল থেকে মুদ্রা প্রচার করেন এবং দুই জনের মুদ্রার মধ্যে অদ্ভুত সামঞ্জস্য আছে। এমতাবস্থায় বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে ইখতিয়ারুদ্দীন ফখরুদ্দীনের পুত্র ছিলেন। ইব্‌ন্ বত্তুতার উক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী গবেষকরা ইখতিয়ারুদ্দীনকে ফখরুদ্দীনের পালিত পুত্র আখ্যা দিয়েছেন। আমরা আগেই বলেছি যে সকল ব্যাপারে ইব্‌ন্ বত্তুতার বর্ণনাকে নির্ভুল মনে করার কোন কারণ নেই। সমসাময়িক ইতিহাসে ইখতিয়ারুদ্দীনের নাম উল্লেখ না থাকার এই হেতু হতে পারে যে বাঙলা দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাঁরা বাঙলা দেশের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেন।

(খ) 'রফিকুল আরেফীন'এ উল্লেখ আছে যে বাঙলা দেশ আক্রমণের প্রাক্কালে ফিরূয শাহ তুঘলক শয়খ শরফুদ্দীন ইয়াহয়া মনেরীর সাথে মোলাকাত করেন এবং শয়খ শরফুদ্দীন ফিরূয শাহের বিজয়ের জন্য দোয়া করেন। এই উক্তির ভিত্তিতে গ্রন্থকার সিদ্ধান্ত করেছেন যে প্রজাদের উপর ইলিয়াস শাহের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে শয়খ শরফুদ্দীন উপরোক্ত দোয়া করেন। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে গ্রন্থকার 'ইনশাহ-ই-মাহরু' এর উল্লেখ করেন যাতে ফিরুয শাহ বাঙলা দেশে কর লাঘব করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এখন প্রশ্ন হয়, ইলিয়াস শাহ যদি এত অত্যাচারই করেন, তিনি বাঙালীদের সমর্থন পেলেন কি করে? সুখময় বাবুও তা স্বীকার করেন, (পৃষ্ঠা ৫৯/১)। দ্বিতীয়তঃ ফিরূযশাহ এর বিরুদ্ধে বাঙালীদের উত্তেজিত করার জন্যই তিনি এই নিশান জারী করেন; এর বিবরণ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে গ্রহণ করা উচিত।

(গ) পৃষ্ঠা ৬৮/১। তারিখ-ই-মুবারক শাহী ও নিয়াত-ই-ফিরূয শাহীর মতে ইলিয়াস শাহ ৭৫৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। ৭৫৮ হিজরী পর্য্যন্ত ইলিয়াস শাহ এর মুদ্রা পাওয়া যায় এবং ৭৫৯ হিজরী থেকে সিকান্দর শাহের মুদ্রা পাওয়া যায়। এই দুই সূত্রের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য গ্রন্থকার প্রস্তাব করেছেন যে শেষ বছরে ইলিয়াস শাহ তাঁর পুত্র সিকান্দর শাহএর অনুকূলে সিংহাসন ছেড়ে দেন। বাংলার সাথে সম্পর্কহীন দিল্লীতে বসে লেখা কেতাবের উক্তির সামঞ্জস্য রাখার জন্য এইরূপ অনুমানের কোন সার্থকতা আছে বলে মনে হয়না। এমনও হতে পারে যে ইলিয়াস শাহ ৭৫৮ হিজরীর শেষে বা ৭৫৯ হিজরীর প্রথম দিকে ইন্তেকাল করেন।

(ঘ) পৃষ্ঠা ১০৫/১—১০৬/১। হিন্দুদের প্রতি সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের নীতি ও রাজা গণেশের অভ্যুত্থান সম্বন্ধে গ্রন্থকার লিখেছেন ঃ

> "কিন্তু, বাংলার সুলতান হিন্দুদের উচ্চপদে নিয়োগ করেছিলেন বলে হিন্দুদের বাড় বেড়েছিল এবং তারই ফলে একজন হিন্দু অত্যধিক প্রতাপশালী হয়ে উঠে ইলিয়াস শাহী বংশকে উচ্ছেদ করে বাংলার সিংহাসন অধিকার করেছিলেন, এই ধারণা সত্য নয়। মুজঃফর শাম্‌স্‌ বল্‌খির একান্ত ভক্ত ধর্ম্মপ্রাণ সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ বল্‌খির উপদেশের ফলে হিন্দুদের সম্বন্ধে যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন, তার কথা পর্য্যালোচনা করলেই রাজা গণেশের অভ্যুত্থানের প্রকৃত কারণ বোঝা যাবে। ৮০০ হিজরায় বল্‌খি গিয়াসুদ্দীনকে এই উপদেশ দেন। গিয়াসুদ্দীন যে বল্‌খির উপদেশ সত্যিই শুনেছিলেন, তার প্রমাণ আছে। গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ ও তাঁর পুত্র সৈফুদ্দীন হম্‌জা শাহের রাজত্বকালে চীন সম্রাটের কাছ থেকে কয়েকবার বাংলার রাজসভায় দূতের দল এসেছিলেন ; তাঁরা বাংলার সুলতানের অমাত্যদের মধ্যে একজনও অমুসলমান দেখতে পাননি। চীনা দূতদলের দোভাষী মা-হুয়ান (মা-হোয়ান) তাঁর 'য়িং-য়ই-শের লান' (য়িং-য় শ্যাং-লান) গ্রন্থে বাংলাদেশ সম্বন্ধে লিখেছেন, "বাংলার রাজার প্রাসাদ এবং ছোট বড় সমস্ত অমাত্যের প্রাসাদ শহরের (রাজধানীর) মধ্যেই। তাঁরা সবাই মুসলমান।"

এই সিদ্ধান্তের বিপক্ষে দুইটি যুক্তি দেওয়া যায়। প্রথমতঃ সুলতানের দরবারে হিন্দু অমাত্য না থাকলেই যে রাজ্যে কোন হিন্দু আমীর (ফিরিশতার মতে গণেশ একজন আমীর ছিলেন) থাকবে না এমন মনে করার হেতু নাই। হিন্দু আমীররা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা হিসাবেও কাজ করতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ

ফিলিপ্‌স অনূদিত মা-হুয়ানের বিবরণে (*Journal of the Royal Asiatic Society 1895*) নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায়।

> "The king and his officers all dress like Mohamedan ; There head-dress a nd cloths are becommingly arranged. The language of the people is Bengali ; Persian is also spoken there."

প্রবোধচন্দ্র বাগচীর (*Visva Bharati Annuals*, Vol. I 1945) অনুবাদও অনুরূপ। সুতরাং গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের আমলে হিন্দু অমাত্য ছিল না এমন মনে ক রার কোন কারণ নেই।

(ঙ) কৃত্তিবাসের সময় নিরূপণ করতে গিয়ে গ্রন্থকার একটা নতুন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তিনি প্রমাণ করতে চান যে কৃত্তিবাস বর্ণিত গৌড়েশ্বর সুলতান রুকনুদ্দীন বারবক শাহ ভিন্ন আর কেউ নয়। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে তাঁর মূল সূত্র হচ্ছে এই যে কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের রাজসভায় যে সব অমাত্যের নাম করেছেন তাঁদের মধ্যে জনৈক কেদার রায় রয়েছে। অন্যান্য সূত্রের সাহায্যে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে কেদার রায় রুকনুদ্দীন বারবক শাহের অধীনস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন।

কৃত্তিবাসের সময় নিরূপণ সম্পর্কে আমার বিশেষ কিছু বলার নেই, কিন্তু নিম্নলিখিত কারণে এই সিদ্ধান্তের উপর সংশয় জন্মে। কৃত্তিবাস যে রাজসভার বর্ণনা দিয়েছেন, তার সব কর্ম্মচারী বা অমাত্যের-ই হিন্দু নাম অর্থাৎ তাঁরা হিন্দু ছিলেন। মুসলমান নরপতি রুকনুদ্দিন বারবক শাহ তাঁর রাজ সভায় শুধু হিন্দু অমাত্য গ্রহণ করেছিলেন এমন যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। অন্যপক্ষে বারবক শাহের শিলালিপি থেকে আমরা জানতে পারি যে তাঁর অনেক পদস্থ মুসলমান কর্ম্মচারী ছিলেন (সুখময় বাবু নিজে এঁদের একটা তালিকা দিয়েছেন, পৃষ্ঠা ১১২—১১৪)। শিলালিপি পাঠে মনে হয় এঁরা বিভিন্ন শাসন কেন্দ্রে বিভিন্ন পদ দখল করেছিলেন। সুখময় বাবুর মত গ্রহণ করলে বলতে হবে, রুকনুদ্দীন বারবক শাহ রাজসভায় শুধু হিন্দু কর্ম্মচারী রেখেছিলেন এবং মুসলমান কর্ম্মচারী-দের রাজধানীর বাইরে শাসন কেন্দ্রে নিযুক্ত করতেন। এ মত গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না এবং কৃত্তিবাসের বর্ণনা রুকনুদ্দীন বারবক শাহের রাজ-সভার বর্ণনা বলে গ্রহণ করার বিপক্ষে এটি একটি বড় প্রমাণ। এ প্রশ্নের মীমাংসা না হলে সুখময় বাবুর সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য হবে না।

(৩) মুসলমান সুলতানদের মুদ্রা বিশ্লেষণে গ্রন্থকার বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন নি। হয়তো অসাবধানতা বশতঃই কয়েকটী ত্রুটী বিচ্যুতি রয়ে গেছে—

(ক) পৃষ্ঠা ৯১। গ্রন্থকার বলেন,

"সম্ভবত নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের বংশে এই নতুন নিয়ম চালু হয়েছিল যে রাজার পুত্র যুবরাজ পদে অভিষিক্ত হবার সময় থেকে পিতার সঙ্গে যৌথ-ভাবে রাজত্ব করবেন এবং ঐ সময় থেকেই পিতার মত তাঁরও নামে মুদ্রা, শিলালিপি প্রভৃতি উৎকীর্ণ হবে।"

পূর্ববর্ত্তী সুলতানদের মুদ্রা আলোচনা করলে গ্রন্থকার দেখতেন যে বাংলা দেশে এই নিয়ম অনেকদিন আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। এতদ্বিষয়ে মৎপ্রণীত *Corpus of the Muslim Coins of Bengal*, Part II, Section VII দ্রষ্টব্য।

(খ) পৃষ্ঠা ১২১। শমসুদ্দীন ইউসুফ শাহএর মুদ্রা আলোচনা কালে গ্রন্থকার লিখেছেন,

"তারপর য়ুসুফ শাহের পিতা বারবক শাহ তাঁর পূর্ববর্তী সুলতানদের ব্যবহৃত 'খলীফৎ আল্লাহ' উপাধিকে প্রায় বর্জনই করেছিলেন; তাঁর কিছু মুদ্রা ভিন্ন আর কোথাও এ উপাধির কোন উল্লেখ দেখিনা, তাঁর কোন শিলা-লিপিতেই এ উপাধি নেই। কিন্তু য়ুসুফ শাহের প্রায় সমস্ত মুদ্রা ও শিলালিপিতেই "খলীফৎ আল্লাহ" উপাধিটী পুরোপুরি উল্লিখিত হয়েছে দেখতে পাই।"

গ্রন্থকারের এ উক্তি ভিত্তিহীন। প্রকৃতপক্ষে বারবক শাহ তাঁর মুদ্রায় শুধু "খলীফৎ আল্লাহ" উপাধিই ব্যবহার করেননি বরং তিনি নিজেকে "খলীফৎ আল্লাহ বি'ল হুজ্জতে-ই-ওয়া'ল বোরহান" ঘোষণা করেছেন। ইউসুফ শাহের মুদ্রায় এই উপাধির কোন উল্লেখ নাই।

(গ) পৃষ্ঠা ১৭০। যেহেতু শামসুদ্দীন মুজফফর শাহের কোন মুদ্রা পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলায় অবস্থিত কোন টাকশাল থেকে উৎকীর্ণ হয়নি বা কোন শিলালিপি ঐ অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়নি, যেহেতু গ্রন্থকার মনে করেন যে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বাংলা তাঁর অধিকার ভুক্ত ছিলনা। পক্ষান্তরে সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের কোন মুদ্রা পশ্চিম ও দক্ষিণ বাংলার কোন টাকশাল থেকে উৎকীর্ণ না হওয়া সত্ত্বেও বা কোন শিলালিপি ঐ সব অঞ্চলে আবিষ্কৃত না হওয়া সত্ত্বেও, গ্রন্থকার ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ্‌কে সমগ্র বাংলার সুলতান হিসাবে গণ্য করেন। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বাংলা মুজফফর শাহের অধীনে না থাকলে কার অধিকারে ছিল তারও কোন ইঙ্গিত গ্রন্থকার দেননি। অথচ মুজফফর শাহের পরবর্ত্তী সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ সমগ্র বাংলার অধীশ্বর ছিলেন।

(৪) সমসাময়িক বা কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী বাংলা সাহিত্যের সূত্র বিশ্লেষণ সকল ক্ষেত্রে বিজ্ঞান সম্মত হয়েছে বলে মনে হয়না। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-বিদদের বাংলা সাহিত্যের প্রতি দুর্বলতা থাকা স্বাভাবিক কিন্তু সাহিত্যের সূত্র ইতিহাসে প্রয়োগ করার সময় কিছুটা সংযম প্রত্যাশা করা যায়। বিশেষতঃ ধর্ম্মীয় সাহিত্যে ধর্ম্ম বিষয়ক উক্তি গুলি ঐতিহাসিক ঘটনাবলী কতটুকু পরিস্ফুট করে তা সঠিক নিরূপন করা দুরূহ ব্যাপার। তাই সমস্ত বর্ণনাকে তার face value দেওয়ার যথেষ্ট বিপদ আছে।

সুখময় বাবু বিজয় গুপ্তের হাসান হোসেন পালা ও চৈতন্য সাহিত্যের হরিদাস পালার উপর ভিত্তি করে জলালুদ্দীন ফতেহ শাহের হিন্দুদের উপর অত্যাচারের অকাট্য প্রমাণ খুঁজে পেয়েছেন। মনে হয় এই দুই ক্ষেত্রে সুখময় বাবু সাহিত্যের প্রতি তাঁর দুর্ব্বলতা প্রকাশ করেছেন। মনসার শক্তি দেখানোর জন্য এবং চৈতন্য ও তাঁর পার্ষদদের অলৌকিকতা প্রদর্শনের জন্য এই সব পালাগুলি ভক্ত বিজয় গুপ্ত ও বৃন্দাবন দাস প্রমুখ লেখকেরা অতিরঞ্জন করেছেন কিনা, সেদিকে সুখময় বাবু নজর দেননি। কিন্তু দুই বর্ণনাতেই যেরূপ অলৌকিকতার প্রকাশ পেয়েছে তাতে তাদের ঐতিহাসিকতার উপর যথেষ্ট সন্দেহের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। পৃষ্ঠা ১৮০ তে ঠিক অনুরূপ সূত্রের সাহায্যে গ্রন্থকার সিদ্ধান্ত করেছেন যে সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন সাহের গাত্রবর্ণ কাল ছিল। এবং তিনি বাঙালী ছিলেন। পৃষ্ঠা ২৯৯—৩১০ এ "হোসেন শাহের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় নীতি" শীর্ষক আলোচনায় গ্রন্থকার সাহিত্যের প্রতি তাঁর দুর্ব্বলতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ দিয়েছেন। ফার্সী ভাষায় পরবর্ত্তী সময়ের লিখিত ইতিহাস ও হোসেন শাহের শিলালিপির সাক্ষ্য থেকে গ্রন্থকার প্রমাণ করেছেন যে হোসেন শাহ সাত্যিকারের নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। কিন্তু কিঞ্চিৎ পরেই চৈতন্য সাহিত্য থেকে তিনি প্রমাণ করেছেন যে হোসেন শাহ হিন্দু ধর্ম্ম তথা পরধর্মের প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না। অথচ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সময় শ্রীচৈতন্যের গতিবিধির সুব্যবস্থার জন্য হোসেন শাহ যে কাজী এবং অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীদের উপর কঠোর আদেশ দিয়েছিলেন, গ্রন্থকার চৈতন্য-সাহিত্যে সে সব সূত্রের কোন উল্লেখই করেন নি। হোসেন শাহের হিন্দুরাজ কর্ম্মচারী কি মন্ত্রী নিয়োগেরও সুখময় বাবু ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

(৫) সুখময় বাবু শয়খ জালালুদ্দীন তব্রীজীকে সিলেটের শাহ জালালের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন। এবিষয়ে তিনি কয়েকটী সূত্র ব্যবহার করেন নি, যেমন কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত ফার্সী পাণ্ডুলিপি 'গুলজার-ই-আবরার' এবং শিলালিপিতে ব্যবহৃত শয়খদ্বয়ের নাম ও উপাধি। এ বিষয়ে আমার লিখিত **'Did Ibn Battutah meet Shaykh jalal-al-din Tabrigl in Kamrup?** (*Journal of the Pakistan Historical Society, 1960.*) এবং এস, এম, ইকরাম লিখিত **An unnoticed account of Shaikh jalal of Sylhet** (*Journal of the Asiatic Society of Pakistan*, 1957) দ্রষ্টব্য।

উপরোক্ত আলোচনা পাঠে অনেকেই হয়ত মনে করবেন, আমি বইটী সম্বন্ধে বিরূপ ভাব পোষণ করি, কিন্তু তা ঠিক নয়। আমার দৃষ্টিতে যে ত্রুটীগুলি ধরা পড়েছে আমি সেগুলি তুলে ধরেছি; হয়ত গ্রন্থকার সেগুলি পুনর্বিবেচনা করবেন এবং যুক্তি সঙ্গত মনে করলে তাঁর মত পালটাবেন। বই-খানির গুণ অনেক। গ্রন্থকার সমসাময়িক ও কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী যুগের লিখিত বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্য থেকে অনেক তথ্য খুঁজে বার করেছেন যা অনেকের হয়ত আগে জানা ছিল না। কয়েকজন সুলতানের উপর, যেমন রুক্নুদ্দীন বারবক শাহ, জালালুদ্দীন ফতেহ শাহ ও আলাউদ্দীন হোসেন শাহ, তিনি নানা সূত্র অবলম্বন করে নতুন আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন। অনেক পূর্ব-স্বীকৃত সিদ্ধান্ত তিনি ভুল প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। তিনি কৃত্তিবাস ও বিজয় গুপ্তের নতুন তারিখ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। এই সব নতুন সিদ্ধান্ত ঐতিহাসিকদের নিকট গ্রহণযোগ্য হোক বা না হোক, পরবর্ত্তী গবেষকদের জন্য সুখময় বাবু পথ-প্রদর্শক হয়ে রইলেন; তাঁরা তাঁর মতামত আরও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করতে পারবেন এবং সূত্রের **authenticity**-সাপেক্ষে গ্রহণ ও বর্জন করতে পারবেন। আগামী দিনের গবেষকদের জন্য সূত্র নির্দ্দেশ করাও গবেষকদের অন্যতম কর্ত্তব্য। সুখময় বাবু নিশ্চয়ই তাঁর এই প্রচেষ্টায় সফলকাম হয়েছেন।

আবদুল করিম